UNIC Dhaka

জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN

A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka

Discover natural fibres 2009

নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০০৯ | November-December 2009

২১তম বর্ষ একাদশ ও দ্বাদশ সংখ্যা | Volume-XXI, No. XI & XII

জলবায়ুজনিত অভিবাসীদের ঢল কি দলবদ্ধভাবে নামবে?

ঐতিহাসিকভাবে জলবায়ুর পরিবর্তনের জন্য যখন গুটি কয়েক দেশ দায়ী, তখন জলবায়ুজনিত অভিবাসীরা তাদের আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম না করলেও বিশ্ব সম্প্রদায়ের কি দায়িত্ব নেয়া উচিত? অভিবাসীদের যখন সীমান্ত অতিক্রম করা প্রয়োজন হয় বা সীমান্ত অতিক্রম করতে হয় তখন তাদের জন্য কি অভিবাসন সুবিধা থাকা উচিত? বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের এই সময়ে এসব গুরুত্বপুর্ণ প্রশ্ন উঠে আসছে।

'জলবায়ুজনিত অভিবাসন' সামাল দেয়ায় বিষয়টি জানার আগে সর্বাগ্রে আমাদের এর বৈশিষ্ট্য ও সম্ভাবনাকে সতর্কতার

> কোন আইনি ব্যবস্থা একজন অভিবাসীরও মর্যাদা বাড়াতে পেরেছে যে অভিবাসী জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তার স্বদেশভুমি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে?

সঙ্গে খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। জলবায়ুজনিত অভিবাসন কি একটা নতুন বিষয়? এর ব্যাপকতা কোন পর্যায়ে যেতে পারে? সবচেয়ে বড় কথা হলো, জলবায়ুজনিত ঘটনাপ্রবাহ কি 'দলবদ্ধভাবে' স্থানীয় বা আঞ্চলিক অভিবাসন ঘটাবে?

জলবায়ুর বিষয়গুলো বিশ্ব জলবায়ুর ধরন ও তীব্রতা অনুযায়ী স্বতন্ত্রভাবে স্থানীয় ও বৈশ্বিক অভিবাসন ঘটায়। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে খরার কারণে বিস্তীর্ণ ভূমি চাষাবাদের অনুপযোগী বা অনিবার্যভাবে অনুৎপাদনশীল হয়ে লোককে শহরে পাড়ি জমাতে বাধ্য করেছে, যেখানে চাকরি-বাকরির নাগাল সবসময়ই পাওয়া যায় না এবং খাদ্য ক্রমবর্ধমান হারে ব্যয়বহুল। সে ক্ষেত্রে দেশের বাইরে পাড়ি দেয়াকে একমাত্র সম্ভাবনাময় সমাধান হিসেবে মনে করা হয়। এভাবেই স্থানীয়

জলবায়ু সমস্যা আন্তর্জাতিক অভিবাসনের পথ সুগম করেছে।

বর্তমান মাঝারি মাত্রায় জলবায়ুজনিত অভিবাসনের কথা হয়তো-বা বাড়িয়ে বলা হলেও এর তীব্রতা ও নিশ্চয়তা সম্পর্কে এতো আগে পুর্বাভাস দেয়া যাচ্ছে না। আর নিশ্চিতভাবে এ কথাও এতো আগে বলা যায় না যে, বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ব্যাপক পরিণতি নেমে আসবে। যেমন, ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্র ও অন্যান্য নিম্নাঞ্চল তলিয়ে নিয়ে যাবে সাগর। আর একথা বলার সময় এখনো আসেনি যে, এর ফলে নজিরবিহীন ব্যাপক অভিবাসন হবে। যেসব বিষয় ব্যাপক অভিবাসন সীমিত করছে সেগুলো

বৈশ্বিক উষ্ণতায়নের আওতা সীমিত করা এবং জীবনের প্রতি হুমকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে আন্তঃমহাদেশীয় ব্যাপক অভিবাসনের সম্ভাবনা ও ধরনের সঙ্গে সংশিস্নষ্ট।

একটা প্রণালিবদ্ধ জলবায়ু পরিবর্তনের পরিস্থিতিতেও সুদীর্ঘ সারিতে ব্যাপক জনসংখ্যার স্থানান্তর হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আজকে যেমন দেখা যায় যে, উদ্বাস্তু শিবির ও আশ্রয় পলস্নীগুলো সচরাচর এমন জায়গায় স্থাপন করা হয় যা দুর্যোগ এলাকা থেকে খুব বেশি দূরে নয়।

বর্তমান যুদ্ধের সংখ্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের পর্যায় এবং সে তুলনায় ঐসব পরিস্থিতিতে পালিয়ে যাওয়া উদ্বাস্তু ও অভিবাসীর সংখ্যার মধ্যে আমরা একটা সাদৃশ্য খুঁজে দেখতে পারি। বিশ্বে বর্তমানে যে কুড়ি বা ততোধিক যুদ্ধ চলছে তাতে হুমকিকবলিত লোকের সংখ্যার সঙ্গে আশ্রয় প্রার্থীর সংখ্যা তুলনা করলে আমরা দেখতে পাই যে প্রকৃতপক্ষে দূরে যারা পালিয়ে যায় ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা তার বহুগুণ বেশি। বর্তমান যুদ্ধে কোটি কোটি লোকের জীবন মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হলেও উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র প্রতি বছর লাখ লাখ আশ্রয় প্রার্থীর আবেদনপত্র পাচ্ছে। প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তের চেয়ে দূরযাত্রার অভিবাসীর সংখ্যা অনেক কম। ক্ষতিগ্রস্তরা সঙ্কট এলাকার কাছাকাছি থাকতে চায় কেন? জলবায়ুজনিত সঙ্কটের কারণে দূরবর্তী স্থানে দলে দলে অভিবাসন কেনই-বা হবে না? প্রথমত, গবেষণায় দেখা গেছে যে, পরিবেশের পরিবর্তনে যেসব লোকের জীবিকা অত্যন্ত সংবেদনশীল তারা হলো সেসব লোক অতিদূরে পাড়ি দেয়ার মতো সঙ্গতি যাদের থাকে না। অনেক দূরযাত্রায় যাওয়ার মতো তথ্য ও আর্থিক সামর্থ্য তাদের নেই; এবং আর তথ্য পেলেও অনেক ক্ষেত্রেই তারা ভ্রমণ করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, ক্ষতিগ্রস্তরা আপনাআপনি অভিবাসন করতে চায় না। যে অভিমতটি ক্রমবর্ধমান হারে মেনে নেয়া হচ্ছে তা হলো বাধ্যতামূলক ও জীবনের প্রতি হুমকিপূর্ণ পরিস্থিতিতেও অভিবাসনের সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবেই স্বেচ্ছামূলক। সচরাচর, ক্ষতিগ্রস্তরা অজানা-অচেনা দূরবর্তী কোনো জায়গায় পাড়ি দেয়ার চেয়ে যতটা সম্ভব তাদের স্বদেশভূমির কাছাকাছি থাকতে চায়। অত্যন্ত দক্ষ ও মৌসুমে যাতায়াতকারী শ্রমিকদের যেসব বিষয় আকৃষ্ট করে তা অনেকক্ষেত্রেই দরিদ্র ও সঙ্কটে ক্ষতিগ্রস্ত দুর্বল লোকদের ক্ষেত্রে হয়তো-বা প্রযোজ্য নয়।

জলবায়ুজনিত অভিবাসীদের, উদাহরণ হিসেবে, শিল্পোন্নত উত্তরে আশ্রয় না চাইবার তৃতীয় কারণটি হলো : সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়লেও এবং দুইশ' কোটি অধিবাসীর শুষ্ক ভূমি আরো উষর হয়ে গেলেও একথাও সত্য যে চীনের উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিমাঞ্চল বা রুশ ফেডারেশনের উত্তরাঞ্চলের মতো বসতির অনুপযোগী অনেক এলাকা উর্বর হয়ে উঠতে পারে। অনেক এশীয় হয়তো ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের দূরবর্তী জায়গায় অভিবাসন করার পরিবর্তে পূর্ব গোলার্ধে থাকাকেই প্রাধান্য দেবে। তাই অভিবাসনের চিরাচরিত পথগুলোকে আংশিক বাদ দিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে ও ভেতরে অভিবাসনের নতুন নতুন পথ গড়ে উঠতে পারে।

প্রবল, স্থায়ী ও দূরগামী অভিবাসনের ব্যাপক ঢলকে চতুর্থ যে কারণটি সম্ভবত ব্যাহত করবে তা হলো বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, যদিও এটা ঘটে চলেছে, কিন্তু তার গতি হবে শম্বুকের। এমনকি অত্যন্ত মারাত্মক ক্ষেত্র হলেও সমুদ্রপৃষ্ঠেয় উচ্চতা বৃদ্ধির প্রক্ষেপিত সর্বাধিক মাত্রা হবে বছরে দশ সেন্টিমিটার। লোকে দূরযাত্রার অভিবাসনের পথে ফিরে না গিয়ে আরো অনেক বেশি গুরুতর ও মারাত্মক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে।

এমনকি নিউ অরলিনসে হারিকেন ক্যাটরিনা বা এশিয়ায় সুনামির মতো একটি আকস্মিক, প্রবল ও সর্বব্যাপী সঙ্কট হলেও লোকে স্থায়ীভাবে দূরবর্তী কোনো গন্তব্যে যেতে সামান্যই উৎসাহবোধ করবে। তারা বরং তাদের বাড়ির কাছাকাছি থাকবে এবং যথা শিগগির সম্ভব প্রত্যাবর্তন করবে। প্রবল পূর্ণমাত্রিক সঙ্কট সৃষ্টি না হলে মন্থর ও দীর্ঘমেয়াদি জলবায়ু পরিবর্তন বিভাগে দ্রুত ব্যাপক বৈশ্বিক অভিবাসন ঘটাবে বলে ধারণা করা যায়? দুটি প্রশ্নের মধ্যে সম্পর্ক টেনে ভবিষ্যৎ অবস্থার দিকে চেয়ে দেখি : জলবায়ুর পরিবর্তন কি একটা স্থানীয়, নাকি বিশেষ কোনো প্রণালিবদ্ধ বিষয়? আসন্ন অভিবাসন কি বৈশ্বিক ও দীর্ঘমেয়াদি হবে, নাকি স্বল্প দূরত্বেও ফিরে আসার মতো হবে?

উপর্যুক্ত চারটি দৃশ্যপটের মধ্যে জলবায়ু সমস্যা অন্তত পক্ষে কার্যত প্রণালিবদ্ধ এবং এর পরিণতিতে যে অভিবাসন হবে তার বৈশ্বিক ও দীর্ঘমেয়াদি হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম। জলবায়ু পরিবর্তনের আভাস-ইঙ্গিত কদাচিৎ প্রণালিবদ্ধ হলেও তা স্থানীয় হিসেবে বিদ্যমান থাকে। কারণ সংশিস্নষ্ট লোকজন আগে থেকে বুঝতে পেরে তদনুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কেবল উপকূলীয় একটা ছোট এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি আর এলাকা বড় হলে সেখানকার অধিবাসীরা মানিয়ে নেয়ার মতো সময় পাবে বেশি। সবচেয়ে বিপর্যয়কর অবস্থার একটি হলো কয়েক বছর বা কয়েক মাস সময়ের

পরিধিতে অপেক্ষাকৃত বেশি মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হলে লোকে কাছাকাছি এলাকায় সরে যেতে চাইবে এবং অবস্থা অনুকূল হলে প্রত্যাবর্তন করবে। যা হোক, যে কোনো স্থায়ী স্থানান্তর যতটা সম্ভব নিকটতম গন্তব্যে হবে, সম্ভবত সেসব এলাকায় যা পরিবেশগত পরিবর্তনের ফলে সম্প্রতি বাসযোগ্য বা উর্বর হয়ে উঠেছে।

এমনকি কয়েক বছর বা কয়েক মাসে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা উলেস্নখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধির ফলে জলবায়ুর পুরোপুরি প্রণালিবন্ধ পরিবর্তন এবং সেই মৌসুমেই ব্যাপক ফসলহানি হলেও অভিবাসনের গন্তব্য স্থানীয় পর্যায়েই থেকে যাবে। নাউরুর জনগণ খুব সম্ভবত পিকটাইমে চলে যাবে। মালদ্বীপের জনগণ ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে জমি নিতে চাইবে। আফ্রিকায় তীব্র ও ব্যাপক খরার ফলে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ঘটতে পারে, যার দরুন ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার দিকে কিছু অভিবাসন হতে পারে। মোট কথা, নিম্নাঞ্চল পস্নাবিত হলে অপেক্ষাকৃত উঁচু এলাকায় ইতোপূর্বে উষর ভাবাপন্ন নতুন, উর্বর কৃষিভূমি খুঁজে বের করা হবে।

যাহোক, সবচেয়ে সম্ভাব্য অবস্থা কেবল জলবায়ু পরিবর্তনের স্থানিক আলামত দেখবে। এসব অবস্থার কিছু অতীতে দেখা গেছে এবং কিছু হয়তো বৈশ্বিক উষ্ণায়নের দরুন দেখা যেতে পারে। তবে যে কোনো অবস্থায়ই পরিণতি হবে মন্থর, যার ফলশ্রুতিতে অভিবাসন মাসের পর মাস ও বছরের পর বছর ধরে ক্রমান্বয়ে হবে। অভিবাসন হবে নিকটবর্তী অঞ্চলে এবং অভিবাসীরা প্রত্যাবর্তন করবে।

পরিশেষে নিবন্ধের শুরুতে আমরা যে প্রশ্নটি রেখেছি সেখানে ফিরে যেতে পারি। ঐতিহাসিকভাবে জরবায়ু পরিবর্তনের জন্য যখন গুটি কয়েক দেশ দায়ী, তখন জলবায়ুজনিত অভিবাসীরা আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম না করলেও বিশ্ব সম্প্রদায়ের কি তাদের দায়িত্ব নেয়া উচিত? উপর্যুক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভবত এটা হবে যে, বেশিরভাগ অভিবাসন স্থানীয় বা আঞ্চলিক পর্যায়ে হবে। এটা অপরিহার্য যে, সংশিস্নষ্ট অঞ্চল ও দেশ যাতে সামাল দিতে পারে তজ্জন্য নতুন জায়গায় ঠাঁই নেয়ার সুবিধার্থে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সুষ্ঠু উত্তরণে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহায়তা দেয়া উচিত।

এর অর্থ হলো তীব্র পরিস্থিতি মোকাবিলা এবং স্থানীয় জনগণের সঙ্গে অভিবাসীদের মিলেমিশে থাকার ব্যবস্থা করার জন্য জাতিসংঘ উদ্বাস্তু বিষয়ক হাইকমিশনার দপ্তরের জোরালো সম্পদের প্রয়োজন। অভিবাসনের ধরনের কারণে তীব্র ও পূর্ণমাত্রার সঙ্কট দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা কম, বরং মন্থর ও অধিক সুশৃঙ্খল স্থানান্তর দেখা যেতে পারে। পরিশেষে কেউ উত্তরণের সফলতা সম্পর্কে আশাবাদী হয়েও থাকতে পারেন। কালক্রমে অভিবাসীরা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করবে ও অন্য কোথাও মানিয়ে নেবে এবং অনেকেই তাদের নিজ নিজ দেশে ফিরে যেতে চাইবে, আর অবস্থা অনুকূল হলে তা পারবেও।

জলবায়ুজনিত অভিবাসীদের জন্য অভিবাসনের বিশেষ সুবিধা কেমন? এগুলো হবে মন্থর এবং অনিবার্যভাবেই মারাত্মক জলবায়ু সঙ্কটের সঙ্গে সংশিস্নষ্ট হবে না। আমরা হয়রানির কারণে উদ্বাস্তুদের অবস্থার মতো 'বলপূর্বক অভিবাসনের' কথা বলতে পারি। কিন্তু হয়রানি সংশিস্নষ্ট উদ্বাস্তুর অবস্থার মতো বাধ্যতামূলক অভিবাসন একটা 'উপায়ান্তরহীন' অবস্থা বোঝায়, যেমন এ অবস্থায় কেউ কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হতে পারে না, আবার অভ্যন্তরীণভাবে পালিয়েও থাকতে পারে না। জলবায়ুজনিত অভিবাসনের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে পরিবর্তন মন্থর হলে জনগণ খুব সম্ভবত স্বেচ্ছামূলকভাবে খাপ খাইয়ে নেবে। তবে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প বা সুনামি হলে যা অনিবার্যভাবেই জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটায়, সেক্ষেত্রে জেনেভা সনদে বর্ণিত উদ্বাস্তুদের মতো এই ক্ষতিগ্রস্তদের 'বাধ্যতামূলক অভিবাসী' হিসেবে বিবেচনার জন্য কিছু আইনি ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। প্রতি বছর সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা দশ সেন্টিমিটার হারে বৃদ্ধি পাওয়াকে অভিবাসন ঘটানোর মতো তীব্র 'বল' হিসেবে চিন্তা করা আরো বেশি কঠিন।

পরিশেষে বিশ্ব জলবায়ুর সম্ভাব্য পরিবর্তনের কারণে অভিবাসনের যে মাত্রা হতে পারে তা অতিরঞ্জন করা কারো ঠিক নয়। জলবায়ু পরিবর্তনের গতি ও ব্যাপ্তি এবং মানুষের খাপ খাওয়ানোর সামর্থ্য বাধ্যতামূলক, তীব্র, জলবায়ুজনিত ব্যাপক অভিবাসনকে সম্ভাবনাহীন করে তোলে। কিছুটা জোয়ার হয়তো দেখা যেতে পারে কিন্তু ভালো প্রস্তুতি এবং বিশ্বের কোনো কোনো অংশে জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি ও একই সঙ্গে জলবায়ু সঙ্কটের সর্বাধিক ঝুঁকে রয়েছে, কোনো কোনো নিকটবর্তী এলাকা জলবায়ুজনিত সম্ভাব্য উদ্বাস্তুদের সাময়িক স্বর্গ হতে পারে, কোনো অবস্থা পূর্বে কঠোর বিবেচিত হলেও আকর্ষণীয় হিসেবে পরিণত করা যায়, জলবায়ুজনিত উদ্বাস্তুদের স্থানান্তরের সুবিধার্থে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সবচেয়ে ভালো কী ব্যবস্থা নিতে পারে–এসব প্রশ্ন নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে তা মোকাবিলাও করা যেতে পারে। পরিশেষে, কোন আইনি ব্যবস্থা একজন অভিবাসীরও মর্যাদা বাড়াতে পেরেছে যে অভিবাসী জরবায়ু পরিবর্তনের কারণে তা স্বদেশভূমি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে?

ইউএন ক্রনিক্যাল প্রবন্ধ

জলবায়ু পরিবর্তন এবং আমাদের অভিন্ন ভবিষ্যৎ : একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত

আমি একবার একটা প্রচারপত্র দেখেছিলাম যাতে জলবায়ুর পরিবর্তন রোধে লোকের প্রতি সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসার আহক্ষান জানানো হয়েছিল। এতে মনে হয়, অনেকেই জানেন না যে জলবায়ুর পরিবর্তন সবসময় হচ্ছে এবং এই পরিবর্তন রোধ সম্ভব নয়। জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে, তবে তার সময় ও বিস্তৃতির পার্থক্য আছে এবং এর পরিবর্তন অনেকগুলো কারণের ফলশ্রুতি যেমন, সূর্য ও বিষুবরেখার মধ্যে দুরত্ব যা ধরণীর তাপ ভান্ডারে অবদান রাখছে এবং কক্ষে পরিক্রমণ পথে পৃথিবীর কিছুটা সরে যাওয়ার দরুন বিষুবরেখা থেকে শৈত্যপূর্ণ মেরু অঞ্চলের মধ্যে তাপমাত্রার পার্থক্য বা সৌর বিকিরণে ব্যবধান।

তাপমাত্রার এই ব্যবধান বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টি করে যা বৃষ্টিপাতকে প্রভাবিত করে। হাজার হাজার বছরজুড়ে এই পৃথিবী তুষারের হিমশীতল স্পর্শের অগণিত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, কিছুকাল পরপর উষ্ণতার কারণে যার হয়েছে পরিবর্তন। সর্বশেষ ১ লাখ ১০ হাজার বছর আগে বড় ধরনের হিমবাহ শুরু হওয়ার পর ১৬ হাজার থেকে ১১ হাজার ৫শ' বছর আগে একটা উষ্ণতার অবস্থায় উত্তরণ ঘটে যার বৈশিষ্ট্য ছিল জলবায়ুর পৌনঃপুনিক আন্দোলন। দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও চীনের অর্ধ-মরু অঞ্চলের মতো জলবায়ু সংবেদনশীল বসতিতে চারক দলগুলো বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও খাদ্য আহরণ প্রযুক্তি গড়ে তোলে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বুনো ঘাসের নিবিড় ব্যবহার ও পশুক্রীড়ার ব্যবস্থা, শান পাথর তৈরি ও ব্যবহার, ফাঁদপাতা, তীর-ধনুকের ব্যবহার ও খাদ্য সংরক্ষণ। কেউ কেউ তাদের শিকার কাজ বাড়ানো অব্যাহত রাখে, আর কেউ বনজ শস্য সম্পদ থেকে সর্বাধিক সুবিধা লাভের প্রয়াসে বসতি স্থাপন করে। সবচেয়ে বেশি সফলতা অর্জন করে ভুমধ্যসাগরের পুর্বাঞ্চলে বসতি স্থাপনকারীরা, যেখানে ছিল গম ও যবের প্রাচুর্য।

কৃষির উদ্ভাবন

১১ হাজার ৬শ' থেকে ৮ হাজার ২শ' বছর আগে জলবায়ুর উষ্ণতা এবং ভুমধ্যসাগরের পুর্বাঞ্চলে আর্দ্রতা বেড়ে যায়। এ সময়ে চারকদের কয়েকটি প্রজন্ম পানির সুব্যবস্থা সংবলিত এলাকায় সুবিধা গ্রহণ করে খাদ্যের প্রধান উৎস হিসেবে চাষাবাদ অবলম্বন করে। কৃষির এই উদ্ভাবন মানবজাতির সবচেয়ে উলেস্নখযোগ্য বৈপস্নবিক অর্জন।

এরপর জীবন আর একই ধারায় থেমে থাকেনি। গ্রামগুলো মিলেমিশে পরিষদ বা সমাজপতির শাসনাধীনে গ্রাম সমাজে পরিণত হয়। এরপর চাষী সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে রাজ্য। যারা গবাদিপশু, ছাগল ও ভেড়া চরিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত তারা হয়ে যায় চারক এবং তারা চলে যায় কৃষকদের পছন্দের নদী বিধৌত উপত্যকার বাইরে বৃষ্টিস্নাত তৃণাঞ্চলে।

রাজনৈতিক দিক থেকে অধিকতর জটিল সংগঠনের নতুন এই কৃষিনির্ভর সমাজের আওতায় মানবজাতির ওপর জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব এক নতুন ধারা পরিগ্রহ করে। আংশিকভাবে এর অনেকটাই হয়েছে কৃষিজ প্রতিবেশের প্রকৃতি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনার কারণে। কৃষি উৎপাদন বছর বছর ওঠানামা করে। এর আংশিক কারণ হলো বৃষ্টিপাতের আন্তঃবার্ষিক তারতম্য; কিন্তু আরো বেশি গুরুত্বপুর্ণ হলো, জরবায়ুর অবস্থায় দশক ও শতবার্ষিক পরিবর্তনের কারণেও বৃষ্টিপাতের পরিমাণে তারতম্য ঘটে। জলবায়ুর এই পরিবর্তন নদীর প্রবাহ ও তৃণাঞ্চলে বৃষ্টিপাতকেও প্রভাবিত করে। তাপদগ্ধ ভুমিতে সেচের জন্য খাল খনন, বাড়তি পানি নিষ্কাশনের জন্য নর্দমা তৈরি এবং বন্যার পানি থেকে জমি ও বসতি রক্ষার জন্য বাঁধ তৈরি করে এসব সমস্যা মোকাবিলা করা হয়।

বিশাল সভ্যতা

কৃষিভিত্তিক সমাজ প্রসারের ফলে সেগুলো আধিপত্য পরম্পরাভিত্তিক ব্যবস্থাপনার জটিল রাজনৈতিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠে। রাষ্ট্রের কর্মকর্তা, বোয়ানি ও যাজকরা রাষ্ট্রের নীতিমালা এগিয়ে নেয়া ও জোরদার করার জন্য

আবার অনুষ্ঠান ও কল্পকথার বিস্তার ঘটায়, যা অধিক খাদ্য উৎপাদনের চাহিদা বৃদ্ধি করে। কৃষকের কাছ থেকে কর আদায়ের মাধ্যমে এসব চাহিদা পূরণ করা হতো। রাষ্ট্রযন্ত্রের বর্ধিত চাহিদা পূরণের জন্য কৃষককে আরো কঠোর পরিশ্রম ও চাষাবাদের জমি বাড়াতে হতো।

'খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ অব্দের দিকে প্রারম্ভিক কৃষিভিত্তিক রাষ্ট্রগুলো মিসর, মেসোপটেমিয়া ও ভারতে বিশ্বের প্রথম বিশাল সভ্যতায় রূপ নেয়। কিন্তু খ্রিষ্টপূর্ব ৪২০০ অব্দ নাগাদ জলবায়ুর এক আকস্মিক বদল সারা বিশ্বে নাটকীয় পরিবর্তনের সূচনা করে।'

নীল নদের তীরে মিসরীয়রা একটি কেন্দ্রভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। খ্রিষ্টপূর্ব ৪৬০০ থেকে ৪২০০ অব্দব্যাপী চারশ' বছর ধরে যেসব শাসক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন তারা নাব্যতা হ্রাসপ্রাপ্ত নীল নদের এক আকস্মিক, অচিন্তনীয় পস্নাবনে সৃষ্ট বিপর্যয়ের পূর্ব পর্যন্ত বিস্ময়কর সব পিরামিড নির্মাণ করেন। বিপর্যয়ের ফলে সরকার ভেঙে পড়ে। গ্রামীণ জনপদে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে এবং সমগ্র দেশ এক নৈরাজ্যে নিপতিত হয়।

খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম সহস্রাব্দের গোড়ার দিকে মেসোপটেমিয়ার যেসব প্রারম্ভিক রাষ্ট্রভিত্তিক সমাজ গড়ে ওঠে সেগুলো বারংবার খরা এবং ফোরাত ও দজলা নদীর বন্যা মোকাবেলার জন্য সেচ ব্যবস্থার ওপর অত্যন্ত নির্ভরশীল ছিল। তারা শেডাফ পানি উত্তোলন যন্ত্র উদ্ভাবন এবং খাল, নিষ্কাশন নালা-নর্দমা, জাঙ্গাল, বাঁধ ও সংরক্ষণাধারের ব্যবহার করে। মেসোপটেমিয়ায় পস্নাবিত ভূমির মাটি লোনাপ্রবণ হওয়ায় উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়। কিন্তু মিসরের মাটির অবস্থা এমন ছিল না। ৪,৫০০ বছর আগে শাসকবর্গ যুদ্ধবিগ্রহে জড়িয়ে পড়ে যা ২০০ বছর পর সমরবাদী আক্কাদীয় সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটায়। আক্কাদীয়রা কর উৎস থেকে আয় বৃদ্ধির মানসে বৃষ্টি বিধৌত অঞ্চলে তাদের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটায়। কিন্তু সমরবাদী রাজ্য চালানোর চড়া মূল্য দিতে হয় ক্ষেতে-খামারে উৎপাদনশীলতা হ্রাস ও কৃষকদের ওপর অতিরিক্ত কাজের চাপের ফলে। আর প্রান্তিক বৃষ্টিনির্ভর জমির উৎপাদনের ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা আক্কাদীয় সাম্রাজ্যকে ভেতর বা বাইরের যে কোনো অস্থিরতার কারণে ভেঙে পড়ার ঝুঁকিতে ফেলে দেয়। উত্থানের পর এক শতাব্দী পার হতে না হতেই সাম্রাজ্যটি ৪২০০ বছর আগে বিশ্বজোড়া তিনটি জলবায়ুর রোষানলে পড়ে যায়।

প্রথমত, ফোরাত ও দজলার প্রবাহ ব্যাপকভাবে হ্রাস পেলে উপত্যকার উৎপাদনশীলতা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। দ্বিতীয়ত, বৃষ্টিনির্ভর কৃষিকাজ খরায় ব্যাহত হয়। জাগরো পার্বত্য এলাকায় বসবাসকারী

খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ অব্দের দিকে প্রারম্ভিক কৃষিভিত্তিক রাষ্ট্রগুলো মিসর, মেসোপটেমিয়া ও ভারতে বিশ্বের প্রথম বিশাল সভ্যতায় রূপ নেয়। কিন্তু খ্রিষ্টপূর্ব ৪২০০ অব্দ নাগাদ জলবায়ুর এক আকস্মিক বদল সারা বিশ্বে নাটকীয় পরিবর্তনের সূচনা করে

গুটিয়ান যাযাবর উপজাতির চারণভূমি খরায় ক্ষতিগ্রস্থ হলে তারা আক্কাদীয় সাম্রাজ্যের দুর্বলতা ও তার অভ্যন্তরীণ হানাহানির সুযোগ গ্রহণ করে। তারা ভ্রমণ অনিরাপদ, অর্থনীতি বিপর্যস্ত ও কর আদায় খর্বিত করে। ফলে সাম্রাজ্য তার গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়।

আরো পূর্বদিকে চীনে ১১,৬০০ বছর আগে থেকে প্রচুর মৌসুমি বৃষ্টিপাতের ফলে ধান ও বজরা চাষ জীবিকার প্রধান উপায়ে পরিণত হয়। তবে ৪২০০ বছর আগে খরা এবং অপ্রতুল বৃষ্টিপাতের কারণে ইয়াংজি নদী বেষ্টিত মধ্যবর্তী এলাকা থেকে লোকজন বসতি ছাড়তে শুরু করে। পীত নদীর গতিপথ পরিবর্তন এবং জলবায়ুর অস্থিরতা ও চাষাবাদে ভূমিক্ষয়ের কারণে আধিপত্য পরম্পরামূলক জটিল সমাজের উত্থান ঘটে। কিন্তু খ্রিষ্টপূর্ব ৪২০০ অব্দে তা জলবায়ুর শীতলীকরণ প্রকোপে হুমকির সম্মুখীন হয়। এর ফলে কেবল যে খরা দেখা দেয় তা নয় বরং হিমমুক্ত দিনের সংখ্যাও কমে যায়, এতে কৃষির উৎপাদনশীলতা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ৪০০০ বিপি পঞ্জিকা বর্ষের দিকে পীত নদীর উপত্যকা জুড়ে লঙ্কান সংস্কৃতি এবং মধ্য চীনে কৃষিনির্ভর সমাজের পতনের মধ্য দিয়ে এটা প্রতীয়মান হয়। এতে আরো প্রতীয়মান হয় যে, খরা হয়তো দুর্ভিক্ষ কাটিয়ে ওঠার জন্য রাজনৈতিক একত্রীকরণ ও সহযোগিতাকে উৎসাহিত করেছে, যা হেনান প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল ও শাঙজি প্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলে প্রায় ৪১০০ থেকে ৩,৬০০ বছর আগে ঐতিহাসিক সূত্রে বর্ণিত প্রথম রাজবংশ চীনের জিয়া রাজবংশের উত্থানের পথ সুগম করে। ৪,২০০ বছর আগে থেকে উৎপাদনের প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে জমি ও শ্রমিক দখলের জন্য প্রধানত যুদ্ধবিগ্রহে অনেক রাজ্য ও সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ঘটে। আরো বেশি হলো অন্ত র্কলহ, করের চাপে ন্যুব্জ অসন্তুষ্ট কৃষক অধ্যুষিত বিস্তৃত ভুখ□ নিয়ন্ত্রণের ব্যয় ও সীমাহীন যুদ্ধবিগ্রহের ব্যয় এসব রাজবংশের দ্রুত পতনের পথ সুগম করে।

খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে পূর্ববর্তী রাজ্য

ও সাম্রাজ্যের অনেকগুলোই রোম সাম্রাজ্য অধিকার করে নেয়। কিন্তু এর আগে যেসব সমস্যা পূর্ববর্তী রাজ্যগুলোর পতন ত্বরান্বিত করেছিল সেই একই সমস্যা প্রায় বিশ্বজোড়া বিশাল রোম সাম্রাজ্যকেও গ্রাস করে। চূড়ান্ত আঘাত হানে খ্রিষ্টীয় তৃতীয় ও পঞ্চম শতাব্দীর জলবায়ুর পরিবর্তন। গুটিয়ান ও আক্কাদীয়দের ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল, এখানেও তেমনিভাবে অশ্বারোহী হুন তীরন্দাজ দল জার্মেনিক উপজাতির ওপর হামলা চালায়। এই উপজাতির লোকেরা আবার চড়াও হয় রোমানদের ওপর। মরু ও অর্ধ-মরুর তৃণভূমির ওপর জলবায়ুর প্রভাবে দ্বাদশ শতকে মঙ্গোলদের হামলা বেড়ে যায়। মঙ্গোলদের পরবর্তী বংশধর এসব মঙ্গোলিয়া, চীন (ইনার মঙ্গোলিয়া), রাশিয়া ও অপর কয়েকটি মধ্য এশীয় দেশে বাস করে। জলবায়ুর অস্থিতিশীলতা কেবল যে মঙ্গোল যাযাবরদেরই স্থায়ী সম্প্রদায়ের ওপর হামলা চালাতে উৎসাহিত করেছে, তা নয়, বরং তা পাকাপোক্ত রাজ্য ও সাম্রাজ্যকেও দুর্বল করে ঝুঁকিতে ঠেলে দেয়।

> বৈশ্বিক উষ্ণায়ন-যাতে শিল্পোন্নত দেশগুলো রাশি রাশি অবদান রেখেছে-তা একটি জাগরণী বার্তা-এ বার্তা কেবল জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকির প্রতি নয়-বরং অনেক করে আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং মূল্যবোধের ঘাটতির প্রতি

জলবায়ুর যে আচরণের ফলে মঙ্গোলদের প্রসার ঘটে তা ছিল বিশ্বব্যাপী এবং এটাকে জলবায়ুর মধ্যযুগীয় ব্যতিক্রম নামে অভিহিত করা হয়। মধ্যযুগে ইউরোপের ওপর জলবায়ুর এই আচরণের গভীর প্রভাব পড়ে। উত্তর আমেরিকাসহ বিশ্বের অন্য অনেক অংশেও এর প্রভাব পড়ে। নবম থেকে ত্রয়োদশ শতকের গোড়া পর্যন্ত মিসরে খরার ফলে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ এবং রাজনৈতিক গোলযোগ দেখা দেয়।

চীনের গৌরবময় তাঙ সাম্রাজ্যের (৯০৭ খ্রি.) সমাপ্তি জলবায়ুর পরিবর্তনে ত্বরান্বিত হয়েছে বলে এখন ধারণা করা হয়। চীনে বার্ষিক মৌসুম চক্রে ঐতিহাসিক পরিবর্তন হয়তো তাঙ সাম্রাজ্যকে পতনের প্রান্তে নিয়ে যায়। দীর্ঘ খরা ও গ্রীষ্মে বৃষ্টির স্বল্পতা কৃষক বিদ্রোহে ইন্ধন জোগায়, যা তাঙ বংশের শাসনের অবসান ঘটায়। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এমন তীব্র শীত মৌসুমের প্রমাণ পেয়েছেন যা ৭০০ থেকে ৯০০ খ্রিষ্টাব্দে আন্তঃউষ্ণমন্ডলীয় সমকেন্দ্রিক অঞ্চলের সঙ্গে সংশিস্নষ্ট বৃষ্টির অভিপ্রয়াণ ঘটায়। জলবায়ুর অনুরূপ একটি ঘটনা মধ্য আমেরিকার ক্লাসিক মায়াদের ছারখার করে দেয়।

এ কথা গুরুত্বের সঙ্গে বলা দরকার যে, সভ্যতার বিলুপ্তির অনেকগুলো কারণের মধ্যে জলবায়ুর পরিবর্তন মাত্র একটি এবং সম্ভবত বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো সমাজ শাসনের ধরনগুলোর সঙ্গে সংশিস্নষ্ট। প্রবীণ সম্রাট জুয়ানজঙ যদি আত্মতুষ্টিতে বিভোর না থাকতেন, কিংবা রাষ্ট্রীয় কার্যাদির প্রতি উদাসীন না হতেন; অথবা দুরাচার মুখ্য মন্ত্রীদের নিয়োগ না দিতেন তাহলে তাঙ সাম্রাজ্যের ওপর জরবায়ুর বিরূপ প্রভাব হয়তো এড়ানো যেতো। দুরাচার মন্ত্রীরা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে দুর্নীতিগ্রস্থ করে ফেলেন। আর ৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দের দিকে সাম্রাজ্যের প্রতি হুমকি সৃষ্টিকারী শত্রু সৈন্যদের প্রতিরোধ করতে তিনি সম্ভবত অসমর্থ ছিলেন। সামরিক রাজতন্ত্র কি জলবায়ুর পরিবর্তনে ঝুঁকিপূর্ণ নয়? নিপীড়নমূলক সামরিক শাসন ব্যতীত খ্রিষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে কি বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে এড়ানো যেতো? পরিশেষে কৃষকদের প্রতি তাঙ সম্রাটের আরো ন্যায়নিষ্ঠ ও হিতকর নীতি কি ৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে তাদের ব্যাপক অভ্যুত্থান রোধ করতে পারত?

সভ্যতার উত্থান বা পতনের প্রধান কারণ হিসেবে জলবায়ুর পরিবর্তনকে আমরা চিহ্নিত করছি না। যখনই হোক, জলবায়ুর পরিবর্তন এমন পদ্ধতির ব্যবস্থাপনায় মোকাবেলা করতে হবে যা নিশ্চিত করবে যে, অসঙ্গত কোনো কার্যকলাপ প্রাকৃতিক বসতির প্রাণশক্তিকে বিঘ্নিত করবে না, শাসকবর্গ গুটিকয়েকের সুবিধার জন্য সাধারণ মানুষকে শোষণ করবে না এবং অন্য জাতির সম্পদ ও মানুষকে ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণে আনা বা লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে সামরিক শক্তির আশ্রয় নেবে না।

পূর্ববর্তী অনেক সমাজ ব্যবস্থা যেমন বিলুপ্ত হয়ে গেছে, তেমনিভাবে আমরাও অত্যন্ত ঝুঁকিতে রয়েছি। বস্তুতপক্ষে এখন পরিস্থিতি আরো খারাপ। কারণ, সব দেশের অর্থনীতি নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত এবং বিগত ২শ' বছর ধরে শিল্পায়নের দরূন গ্রহের ওপর দূষণের পুঞ্জীভূত প্রভাবে এখন বিশ্বব্যাপী জলবায়ুজনিত একটা বিপর্যয়ের হুমকি সৃষ্টি হয়েছে। এই গ্রহ এখন জনসংখ্যাধিক্যে ভারাক্রান্ত, জনাকীর্ণ ও নগরাকীর্ণ। আমাদের একটি অপরিহার্য সম্পদের কথা যদি বলা হয়, তাহলে বিগত ৫০ বছরের পানির চাহিদা বেড়েছে, একশ' কোটির বেশি মানুষ পরিষ্কার পানির সুযোগ থেকে বঞ্চিত রয়েছে। আমার মতে, স্বল্প দূরদর্শী জাতীয়তাবাদী নীতি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিহার করা একটি বৈশ্বিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ব্যতীত বিশ্ব সমস্যার আর কোনো সমাধান নেই।
এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান আমাদের হুমকিকবলিত পরিবেশের পুনর্বাসন এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্য হ্রাসে নতুন ও নিরাপদ প্রযুক্তির বিকাশ ও প্রচারের লক্ষ্যে সব জাতির বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা, আর্থিক ও মানব সম্পদ একীভূত ও সমন্বিত করবে। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন- যাতে শিল্পোন্নত দেশগুলো রাশি রাশি অবদান রেখেছে- তা একটি জাগরণী বার্তা-এ বার্তা কেবল জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকির প্রতি নয় বরং অনেক বেশি করে আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং মূল্যবোধের ঘাটতির প্রতি।

ইউএন ক্রনিক্যাল প্রবন্ধ

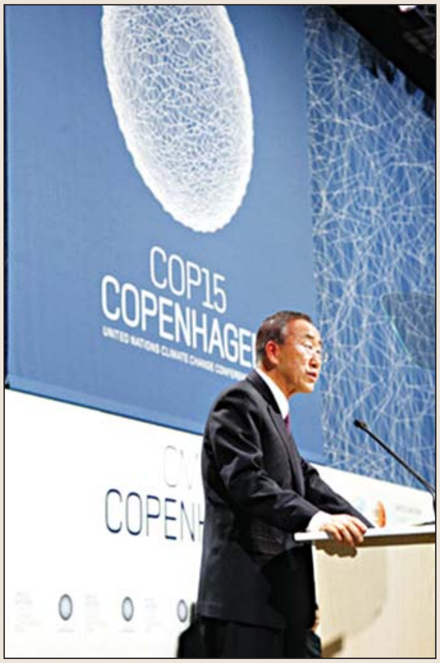

ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে ইউএনএফ সিসিসি সিওপি ১৫-এর উচ্চপর্যায়ের সম্মেলনে মহাসচিবের ভাষণ

১৫ ডিসেম্বর, ২০০৯

ডেনমার্কের মহামান্য যুবরাজ, মহামান্য প্রিন্স অব ওয়েলস, প্রধানমন্ত্রী রাসমুসেন, মন্ত্রী হেডেগার্ড, সিওপি ১৫-এর সভাপতি মি.ডি বোয়ের, মান্যবর বিশিষ্ট প্রতিনিধি, ভদ্রমহিলা ও মহোদয়বৃন্দ,

আমাদের শুরু করার আগে এই ঐতিহাসিক নির্ধারণী মুহূর্তে উপনীত হওয়ার জন্য আমরা কতটা অগ্রসর হতে পেরেছি তা তুলে ধরতে খানিকটা সময় নিতে চাই।

অনেকেই বলেছেন যে, এই দিন কখনো আসবে না। সংশয়বাদীরা বছরের পর বছর বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তন একটা কল্পকথা। তারা যে ভুল তা বিজ্ঞান প্রমাণ করে দিয়েছে। দু'বছর আগে জলবায়ু নিয়ে আমাদের নতুন একটি আলোচনা শুরু করার প্রচেষ্টা তারা নাকচ করে দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও বালিতে তাদের আমরা কোপেনহেগেনের একটা রোডম্যাপ দিয়েছিলাম।

মাসখানেক আগের মতো সাম্প্রতিক সময়ে তারা আবারও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। 'কোপেনহেগেন ব্যর্থ হবে' তারা বলেছেন। পথ অত্যন্ত শক্ত, সঙ্কট অনেক বড়। আজ আমরা এখানে এসেছি একটি ভিন্ন ভবিষ্যৎ রচনার উদ্দেশ্যে। একশ' ত্রিশটির বেশি রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান কোপেনহেগেনে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করেছেন অর্থাৎ এটা একটা পরিষ্কার প্রমাণ যে, জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্ব এজেন্ডার শীর্ষে উঠে এসেছে। আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি সমভাবে শিল্পোন্নত দেশ, উদীয়মান অর্থনীতি ও উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে প্রতিটি দিন নতুন নতুন অঙ্গীকার নিয়ে আসছে।

আমরা জানি, আমাদের অবশ্যই কী করতে হবে। আমরা জানি, বিশ্ব কী প্রত্যাশা করছে।

এখানে এবং এখন আমাদের কাজ কী একটি চুক্তি মোহরাঙ্কিত করা? আমাদের অভিন্ন স্বার্থে একটি চুক্তি। একটি চুক্তি যা গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস করবে? যা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণদের রক্ষা করবে? যা সবার জন্য পরিচ্ছন্ন উন্নয়ন ও সবুজ বিকাশের একটি নতুন যুগের সূচনা করবে।

এখন হলো সময়। জলবায়ু সমস্যা সমাধানে বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে টেবিলে আনার জন্য আমি তিনটি বছর চেষ্টা করেছি। এখন তারা আসছেন। প্রচেষ্টার তিনটি বছর তিন দিনের আলোচনা ও তিনদিনের কার্যক্রমে নেমে এসেছে।

ভদ্রমহিলা ও মহোদয়বৃন্দ,

অফিসে আমার প্রথম দিন থেকেই আমি জলবায়ু পরিবর্তনের কথা জোরালোভাবে বলেছি। এটা আমাদের যুগের একটা নির্ধারণী চ্যালেঞ্জ।

আমরা যেসব বিশ্ব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন তার মধ্যে কোন বিষয়টি বেশি মৌলিক নয়-দারিদ্র্য হ্রাস, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা, শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা?

প্রমাণ আমাদের আঘাত হানছে : হিমমুকুট গলা, মরু বিস্তার, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি।

একটা সুযোগ কি আমাদের আছে? একটা প্রকৃত সুযোগ? এখানে এবং এখন? আমাদের ইতিহাসের ধারা বদলানোর। গতিবেগ আছে। আমাদের সমাজের সকল খাত থেকে আমরা এটা দেখছি। ব্যবসায়ী? সুশীল নেতৃবৃন্দ? ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ? এবং তরুণ-তরুণী। দু'মাস আগে নিউইয়র্কে সাধারণ পরিষদে জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর আমি একটি শীর্ষ সম্মেলন ডেকেছিলাম। আপনাদের অনেকেই সেখানে ছিলেন। সে সময় সমগ্র বিশ্ব থেকে যেসব তরুণ আমাদের কাছে প্রত্যাশা নিয়ে এসেছিল তাদের কথা আপনারা মনে রাখবেন। তারা বলেছিলেন, 'আমাদের পরিবর্তন দেখান। আমাদের নেতৃত্ব দেখান।'

ভদ্রমহিলা ও মহোদয়বৃন্দ,

আমরা জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক

একটি চুক্তি মোহরাঙ্কিত করার জন্য আজ এখানে এসেছি।

একটি চুক্তি প্রণয়নের জন্য যা সকল জাতি বরণ করে নিতে পারে।

একটি চুক্তি তা কি ন্যায়সঙ্গত? উচ্চাভিলাষী? এবং ব্যাপক। তা কি বিজ্ঞানের চাহিদা স্বীকার করে? তাতে সব দেশ জড়িত যারা বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি দুই ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমিত রাখার জন্য কাজ করছে? যা একটি সবুজ বিকাশের পথরেখা তৈরি করবে এবং জলবায়ুর অনিবার্য পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে আমাদের সামর্থ্য জোরদার করবে।

মান্যবর, বিশিষ্ট প্রতিনিধি, ভদ্রমহিলা ও মহোদয়বৃন্দ,

এর অর্থ কী তা আমরা সবাই জানি; প্রথমত, শিল্পোন্নত দেশগুলোর কাছ থেকে আরো বেশি উচ্চাভিলাষী লাঘব লক্ষ্যমাত্রা। দ্বিতীয়ত, উন্নয়নশীল দেশগুলোকে 'বরাবর যেমন হয়' তার নিচে নির্গমন সীমিত রাখার কার্যক্রম গ্রহণ করা। তৃতীয়ত, সব দেশের জন্য একটি সঙ্গতিবিধান কাঠামো। চতুর্থত, অর্থায়ন ও প্রযুক্তি সহায়তা। পঞ্চমত, স্বচ্ছ ও ন্যায়সঙ্গত শাসন যা সব দেশকে কথা বলার সুযোগ দেবে। অর্থায়ন হবে চাবিকাঠি, বিশেষ করে দরিদ্রতম দেশগুলোর সাহায্যে। তাই কোপেনহেগেন সূচনা (Lavnch) তহবিলে আগামী তিন বছর বার্ষিক প্রায় এক হাজার কোটি ডলার করে প্রদানে উন্নত দেশগুলোর মধ্যে যে ঐকমত্য গড়ে উঠেছে আমরা তাকে স্বাগত জানাতে পারি। এই অর্থে আমরা সত্যিকার সুফল দিতে পারব? জলবায়ুর পূর্ববর্তী স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন জোরদার করতে পারব? বন উজাড় সীমিত করতে পারব? নির্গমন হ্রাসে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারব? কিন্তু একটি দ্রুত সূচনা হলো ঠিক একটি সূচনা। বছরে এক হাজার কোটি ডলার আমাদের সব সমস্যা সমাধান করবে না।

এখানে কোপেনহেগেনে আমাদের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ব মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন বিষয়ও নিষ্পত্তি করতে হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমরা কীভাবে অগ্রসর হবো সে ব্যাপারে একটি সমঝোতা ছাড়া আমরা এখান থেকে যেতে পারি না।

মান্যবর, বিশিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দ,

আমি বলছি যে, আমরা অনেক দীর্ঘ, দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি। শেষ পর্যায়ে এসে আমরা যাতে দ্বিধান্বিত না হই। আমাদের লক্ষ্য হলো, ২০১০ সালে যত শিগগির সম্ভব আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক একটি জলবায়ু চুক্তির ভিত্তি স্থাপন করা। আলোচনা করার জন্য আরেকটি বছর আমাদের নেই। প্রকৃতি আমাদের সঙ্গে আলোচনা করছে না। আমি বুঝতে পারি যে, কোপেনহেগেনে যেসব নেতা আসছেন তাদের প্রত্যেককে দেশের চাপ ও দেশের নীতি মোকাবিলা করতে হয়। আমি এ কথাও জানি যে, সবচেয়ে ঝুঁকিতে যারা তাদের সঙ্গত উৎকণ্ঠা রয়েই গেছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষার মাত্রা যথেষ্ট নয়। আমরা যদি একটি সত্যিকার বৈশ্বিক সাড়া জাগাতে না পারি তাহলে কিন্তু প্রতিটি নাগরিকের কল্যাণ বিপন্ন হবে। এখনি। সর্বাধিক সম্ভব প্রাপ্তির অবস্থান নিয়ে আলোচনার সময় ফুরিয়ে গেছে। আলোচনায় আপনার শরিকদের কাছে অযৌক্তিক দাবি করা ও তাদের ওপর চাপ সৃষ্টির সময় ফুরিয়ে গেছে। সময় এসেছে ঐকমত্যের।

এ আলোচনায় কেউই যা চাইবে তার সবকিছু পাবে না। তবে আমরা যদি একযোগে কাজ করি এবং একটি চুক্তিতে উপনীত হই, তাহলে প্রত্যেকেই যা প্রয়োজন তা পাবে। এখানে কোপেনহেগেনে মতৈক্য যত জোরালো হবে তত শিগগির তা একটা আইনিভাবে বাধ্যতামূলক চুক্তিতে পরিণত হবে। এমন একটা চুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত কিয়োটো প্রটোকলই হ্রাসের অঙ্গীকার সংবলিত একমাত্র আইনিভাবে বাধ্যতামূলক চুক্তি হয়ে থাকছে। তাই এটা বহাল রাখতেই হবে।

কোপেনহেগেনের আলোচনা বিশ্ব সম্প্রদায়ের আয়োজিত সবচেয়ে জটিল ও উচ্চাভিলাষী আলোচনার অন্যতম। পুরোপুরি ব্যাপ্তি ও পরিণতিতে এসব আলোচনা সেই আলোচনার মতোই অতিগুরুত্বপূর্ণ যা আমাদের মহান জাতিসংঘ সৃষ্টি করেছিল? এবং আমাদের আধুনিক যুগ গড়ে তুলেছে? ষাট বছরের বেশি সময় আগে যুদ্ধের ভস্ম থেকে।

আবার আমরা ইতিহাসের তীক্ষ্ণ ডগায় রয়েছি। আবার আমরা এক নতুন যুগের উদ্বোধনীতে উপস্থিত হয়েছি। আমাদের ভবিষ্যৎ আজ শুরু হচ্ছে। এখানে কোপেনহেগেনে। আপনাদের অঙ্গীকারের জন্য অনেক ধন্যবাদ।

চিত্রে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রম

মানবাধিকার দিবস উদ্‌যাপন
১০ ডিসেম্বর ২০০৯

মানবাধিকার দিবস পালন উপলক্ষে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ও ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি যৌথভাবে এক সেমিনার, কবিতাপাঠ ও নাটিকার আয়োজন করে। ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত সেমিনারে মুল প্রবন্ধ পাঠ করেন তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা এবং এতে সভাপতিত্ব করেন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. আমিনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন ডেইলি স্টার পত্রিকার স্টার ক্যাম্পাসের সম্পাদক জনাব শাহনুর ওয়াহিদ এবং ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য। জাতিসংঘ মহাসচিবের বাণী পাঠ করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের রেফারেন্স লাইব্রেরিয়ান মো. মনিরুজ্জামান। অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় পর্বে মানবাধিকারের ওপর এক কবিতা পাঠের আয়োজন করা হয়। এতে বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবিগণ কবিতা পাঠ করেন। শেষ পর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে ‘গাহি সাম্যের গান’ শিরোনামে এক নাটিকা মঞ্চস্থ হয়।

সভাপতির বক্তব্য রাখছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আমিনুল ইসলাম

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী অতিথিবৃন্দ, কবি ও নাট্যকমীদের গ্রুপ ছবি

জাতিসংঘ রেডিও অনুষ্ঠান বিষয়ে ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত
ঝিনাইদহ, ৪ ডিসেম্বর ২০০৯

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র এবং ইয়থ হবি ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি যৌথভাবে গত ৪ ডিসেম্বর ঝিনাইদহ জেলায় জাতিসংঘ রেডিও অনুষ্ঠান সংক্রান্ত এক ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। এতে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলো থেকে রেডিও লিসনার্স ক্লাবের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা এতে মুল বক্তব্য উপস্থাপন করেন। আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের বেতার খুলনা অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রকৌশলী রবিউল ইসলাম এবং ইয়ুথ হবি ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক জামান সিদ্দিকী ও রেডিও লিসনার্স ক্লাবের প্রতিনিধিবৃন্দ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন জাতিসংঘ্য তথ্য কেন্দ্রের রেফারেন্স গ্রন্থাগারিক মো. মনিরুজ্জামান।

বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ বেতারের আঞ্চলিক প্রকৌশলী রবিউল ইসলাম

মুল বক্তব্য উপস্থাপন করছেন জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা

চিত্রে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রম

জাতিসংঘ লাইব্রেরি নেটওয়ার্ক কর্তৃক জলবায়ু পরিবর্তন, সামাজিক বিজ্ঞান তথ্য নেটওয়ার্ক ও বিবলিওমেট্রিক্স বিষয়ে ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

১৯ নভেম্বর ২০০৯

সম্প্রতি জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ও ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্ট বাংলাদেশ যৌথভাবে জাতিসংঘ লাইব্রেরি নেটওয়ার্ক সদস্যদের জন্য জলবায়ুর পরিবর্তন, সামাজিক বিজ্ঞান তথ্য নেটওয়ার্ক ও বিবলিওমেট্রিক্স বিষয়ে দিনব্যাপী এক ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। ৪০ জন গ্রন্থাগার ও তথ্য পেশাজীবী অংশগ্রহণ করেন। ওয়ার্কশপে জলবায়ুর পরিবর্তনের ওপর বক্তব্য উপস্থাপন করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন ইউল্যাব-এর সহযোগী অধ্যাপক ড. শাহনাজ হুসনে জাহান। এছাড়া রিসোর্স পার্সন হিসেবে আরও বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. এস এম মান্নান ও ড. জাবেদ আহমেদ। ওয়ার্কশপটি সঞ্চালন করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের রেফারেন্স গ্রন্থাগারিক ও ইউএন লাইব্রেরি নেটওয়ার্কের সদস্য সচিব মো. মনিরুজ্জামান।

বক্তব্য রাখছেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা

ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের গ্রুপ ছবি

জলবায়ুর পরিবর্তন বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহ, ৪ ডিসেম্বর ২০০৯

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ও ইয়ুথ হবি ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। কোপেনহেগেন বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সেমিনারটির আয়োজন করা হয়। ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন এবং জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন। সেমিনারে আরও বক্তব্য রাখেন ইয়ুথ হবি ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির সভাপতি এবং জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের রেফারেন্স লাইব্রেরিয়ান। বিভিন্ন এন জি ও প্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা, সিভিল সোসাইটি প্রতিনিধি, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ এতে অংশগ্রহণ করেন। আলোচকবৃন্দ জলবায়ুর পরিবর্তন ও পরিবেশ বিপর্যয়ের বিভিন্ন দিক উলে-খ করেন এবং এগুলো থেকে উত্তরণের জন্য সবাইকে একত্র হওয়ার আহ্বান জানান।

সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের একজন বক্তব্য রাখছেন

বক্তব্য প্রদান করছেন ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র

১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবসে মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু বৈষম্যহীনতা

'বৈষম্যের লক্ষ্য হয় এমন সব ব্যক্তি ও গ্রুপ, যারা হামলার ঝুঁকিতে থাকে : এরা হলো পিছিয়ে থাকা ব্যক্তি, নারী ও মেয়ে, দরিদ্র, অভিবাসী, সংখ্যালঘু এবং তাদের সবাই যাদের ভিন্ন বলে মনে করা হয়। ... কিন্তু বৈষম্যের এসব শিকার একার নয়। জাতিসংঘ তাদের পাশে আছে, তাদের সবার বিশেষ করে যারা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছে, তাদের অধিকার রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ। এটাই আমাদের পরিচয় এবং আমাদের বিশেষ দায়িত্ব।'

– মহাসচিব বান কি-মুন

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের মতো সব মানবাধিকারের বাস্তবায়ন বৈষম্যের কারণে ব্যাহত হচ্ছে। প্রায় ক্ষেত্রেই পূর্ব সংস্কার ও বৈষম্যের সম্মুখীন হলে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সরকার ও সাধারণ নাগরিকরা হয় নীরব থাকেন, না হয় আত্মতুষ্টিতে ভোগেন।

তবে আমরা প্রত্যেকেই একটা ভিন্নতা আনতে পারি। ১০ ডিসেম্বর এবং তার পরবর্তী সময়ে বৈষম্যহীনতার পক্ষাবলম্বন, কার্যক্রমের আয়োজন, সচেতনতা বৃদ্ধি ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমে মানবাধিকার দিবস উদযাপনে আপনাদের উৎসাহিত করা হচ্ছে।

শিশু অধিকার কনভেনশনের ২০ বছর

১৯৮৯-২০০৯ : কনভেনশন শিশু অধিকারের ক্ষেত্রে অগ্রগতি আনলেও চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে

সব শিশুর মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক প্রতিপালনীয় প্রথম আন্তর্জাতিক কনভেনশন শিশু অধিকার কনভেনশন ১৯৮৯ সালে গৃহীত হয়। বিগত ২০ বছরে শিশু অধিকারের ক্ষেত্রে বিপুল অগ্রগতি হলেও আরো অনেক কাজ অনিষ্পন্ন রয়েছে। ইউনিসেফের নীতি ও চর্চা বিভাগের লিঙ্গ এবং অধিকার ইউনিট প্রধান ড্যান সেম্যুর তাঁর মূল্যায়ন তুলে ধরেছেন।

শিশুদের উপযোগী একটি বিশ্ব অর্জনের ঐতিহাসিক প্রচেষ্টায় শিশু অধিকার কনভেনশন (সিআরসি) একটি বড় মাইলফলক। আন্তর্জাতিক আইনের একটি বাধ্যতামূলক চুক্তি হিসেবে এতে যেসব নীতি সঙ্কলিত করা হয়েছে কেবল মানব পরিবারে জন্ম নেয়ার কারণেই সব দেশ ও সমাজের, সবসময়ের এবং কোনোরূপ ব্যতিক্রম ছাড়াই সব শিশুর জন্য সর্বজনীন বলে জাতিসংঘের সব সদস্য দেশ সেগুলো স্বীকার করে নিয়েছে। এই চুক্তি শিশুদের আরো ভালো সুরক্ষা দানের লক্ষ্য সংবলিত আইনে পরিবর্তন আনয়নে অনুপ্রেরণা দিয়েছে, শিশুদের কাজে নিয়োজিত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর চলার পথ পাল্টে দিয়েছে এবং সশস্ত্র সংঘাতের পরিস্থিতিতে শিশুদের ভালোভাবে রক্ষা করার এজেন্ডাকে সমর্থন করেছে।

বিশ্বব্যাপী অভিঘাত

বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলে আমরা আইন ও চর্চার ক্ষেত্রে সিআরসির অভিঘাতের অগণিত উদাহরণ দেখতে পাই। কনভেনশন অনুমোদনের পর ১৯৯০ সালে ব্রাজিল সিআরসির নীতিমালার ভিত্তিতে শিশু-কিশোরদের জন্য একটি নতুন সংবিধি গ্রহণ করে। কনভেনশনে বর্ণিত অংশগ্রহণের নীতির প্রতি সাড়া দিয়ে বুরকিনা ফাসো প্রস্তাবিত আইন পর্যালোচনার জন্য একটি শিশু পার্লামেন্ট গঠন করেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার অনুমোদন করা প্রথম আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিআরসি যা দৈহিক শাস্তি নিষিদ্ধকরণ ও একটি পৃথক বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলার মতো পরিবর্তন আনয়ন করেছে। রুশ ফেডারেশনও সিআরসির প্রতি সাড়া দিয়ে কিশোর ও পারিবারিক আদালত স্থাপন করেছে। আর মরক্কো একটি জাতীয় শিশু অধিকার পরিবীক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করেছে। কনভেনশনের অনুপ্রেরণায় ফিনল্যান্ড শুরু শৈশব শিক্ষা ও লালনের একটি পরিকল্পনা, ব্যাপক স্কুল শিক্ষার একটি শিক্ষাক্রম, স্কুলে স্বাস্থ্যসেবার মানসম্মত সুপারিশ এবং দারিদ্র্য ও সামাজিক বর্জনবিরোধী একটি কর্ম পরিকল্পনার মতো নতুন কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

আর ইরিত্রিয়া শিশুদের অবহেলা, অপব্যবহার বা পরিত্যাগ করলে বাবা-মা বা অভিভাবকের জন্য শাস্তির বিধান রেখে অন্তর্বর্তীকালীন দন্ডবিধি জারি করছে।

ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ

সিআরসির এই ব্যাপক গ্রহণ এই ভুল ধারণা দিতে পারে যে, এটা চ্যালেঞ্জপূর্ণ বা নতুন নয়। তবু শিশুরা যে অধিকারের ধারক এই ধারণাটি সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত হতে এখনো অনেক দেরি। অনেক শিশুকে বয়স্কদের সম্পত্তি হিসেবে মনে করা হয় এবং তারা বিভিন্ন ধরনের অপব্যবহার ও শোষণের শিকার। ধারা ১২-এ বর্ণিত শিশুদের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে তাদের বলার অধিকার থাকার স্বীকৃতিকে কেবল নিয়মিতভাবে অশ্রদ্ধাই করা হচ্ছে না, বরং এই স্বীকৃতির বৈধতা নিয়েও অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। কনভেনশনের ধারা ৩-এর চাহিদা অনুযায়ী শিশুদের ব্যাপারে সব সিদ্ধান্তে শিশুদের সর্বোত্তম স্বার্থ মুখ্য বিবেচিত হয় এমন একটি বিশ্বে আমরা বসবাস করছি বলে দাবি করতে পারি না। বস্তুত মানুষের সম্পদ বণ্টন, শিশুদের জন্য সর্বোত্তম বিষয়টি নিশ্চিত করার প্রতি সীমিত মনোযোগদান ও যুদ্ধ করার রীতির মধ্য দিয়ে বিপরীত অবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায়।

পরিবর্তনের ভিত্তি

বিশ্ব যেভাবে তার শিশুদের প্রতি আচরণ করছে

তাতে গভীর ও ব্যাপক পরিবর্তন আনয়নের একটি দাবি অন্যান্য শক্তিশালী ধারণার মতো সিআরসিতে প্রতিফলিত রয়েছে।

বিশ্ব যে তার শিশুদের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে ব্যর্থ হচ্ছে– এমনকি শিশুদের অধিকার থাকার কথাও অস্বীকার করছে তা প্রতিরোধযোগ্য কারণে মারা যাওয়া, স্কুলে না যাওয়া বা স্কুলে গেলেও তাদের জন্য একটা সুন্দর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে না পারা, বাবা-মা এইডসে মারা গেলে পরিত্যক্ত হওয়া বা নিজেদের রক্ষায় অসমর্থ সহিংসতা, শোষণ ও অপব্যবহারের শিকার হওয়া শিশুদের আশঙ্কাজনক সংখ্যার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট। আমরা এমন দাবি করতে পারি না যে, যা অর্জন করা দরকার ছিল কনভেনশন তা অর্জন করেছে। বরং যে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন তাতে আমাদের ভূমিকা পালনের অপরিহার্য একটি ভিত্তির ব্যবস্থা তা করে দিয়েছে।

কনভেনশনের ক্ষমতা

পরিবর্তন কার্যকর করার জন্য সিআরসিকে আমাদের পরিপূর্ণ অর্থে ব্যবহার করতে এবং এর তিনটি মৌলিক ক্ষমতার সুবিধা গ্রহণ করতে হবে।

- প্রথমত, এটি একটি আইনি দলিল যা সরকারগুলোর এখতিয়ারের মধ্যে শিশুদের প্রতি তাদের দায়িত্ব দ্ব্যর্থহীনভাবে তুলে ধরেছে।
- দ্বিতীয়ত, সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে সক্রিয় বিভিন্ন কর্মকুশীলব শিশু অধিকারের প্রতি সাড়াদানের যে দায়িত্ব বহন করে এটি তার একটি কাঠামো এবং এসব কর্তব্য পালনে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, সম্পদ ও কর্তৃত্ব অনুধাবনে তা আমাদের সাহায্য করে।
- তৃতীয়ত, আমাদের সবচেয়ে ভালো যা আছে তা বিশ্বের শিশুদের সম্মিলিতভাবে দেয়ার অঙ্গীকার সম্পর্কে এটি একটি নীতিগত বিবৃতি যা মূল মানবিক মূল্যবোধকে প্রতিফলিত করে এবং এই মূল্যবোধই তার ভিত্তি।

আমরা যেসব কাজ ফেলে রেখেছি, সবকিছুর মধ্যে সিআরসির ২০তম বার্ষিকী আমাদের তাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। কনভেনশন এমন একটা বিপস্নব চায় যা শিশুদের মানব উন্নয়নের মর্মমূলে নিয়ে যাবে– তা যে কেবল এর মাধ্যমে আমাদের বিনিয়োগের একটা জোরালো প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে (যদিও প্রাপ্তি ঘটে) তার জন্য নয় কিংবা শৈশবের নাজুক অবস্থা আমাদের সহানুভূতি আশা করে (যদিও তা করতে পারে), তার জন্যও নয়, বরং আরো বেশি মৌলিক কারণ হলো। এটা তাদের অধিকার।

বিশ্ব শিশু দিবস

আমরা শিশু বিশ্ব শিশু শীর্ষ সম্মেলনের ফলানুবর্তন সম্পর্কে মহাসচিবের রিপোর্টের বর্ষ-শেষ পর্যালোচনা (২০০১)

‘একসময় আমরা সবাই ছিলাম শিশু। আর আমরা সবাই আমাদের শিশুদের কল্যাণের ইচ্ছে পোষণ করি, যে ইচ্ছে সবসময় ছিল এবং যা মানুষের সর্বাধিক সর্বজনীনভাবে লালিত আকাঙ্ক্ষা হিসেবে অব্যাহত থাকবে।’

১৯৫৪ সালের ১৪ ডিসেম্বর ৮৩৬ (IX) নং প্রস্তাবের মাধ্যমে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ সুপারিশ করে যে, সব দেশ বিশ্ব শিশু দিবস হিসেবে একটি দিন প্রতিষ্ঠিত করবে, যা শিশুদের মধ্যে বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃত্ব ও সমঝোতার দিন হিসেবে পালিত হবে। পরিষদ সুপারিশ করে যে, দিনটি সনদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য এবং বিশ্বের শিশুদের কল্যাণে এগিয়ে নেয়ার কর্মতৎপরতায় নিবেদিত দিন হিসেবেও পালিত হবে। পরিষদ সব দেশের প্রতি তাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ বিবেচনায় উপযুক্তভাবে দিনটি নির্ধারিত তারিখে পালনের আহ্বান জানায়। ২০ নভেম্বর হলো সেইদিন যেদিন সাধারণ পরিষদ ১৯৫৯ সালে *শিশু অধিকার ঘোষণা* এবং ১৯৮৯ সালে *শিশু অধিকার কনভেনশন* গ্রহণ করে।

২০০০ সালে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ *মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোর (এমডিজি)* রূপরেখা তুলে ধরেন, যাতে রয়েছে চরম দারিদ্র্য অর্ধেকে নামিয়ে আনা থেকে এইচআইভি/এইডসের বিস্তার রোধ ও সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা– যার সবগুলোরই লক্ষ্য নির্ধারিত সময় ২০১৫ সাল। লক্ষ্যগুলো সব মানুষের জন্য হলেও প্রধানত এগুলো শিশুদের জন্য। *ইউনিসেফ উলেস্নখ করেছে* যে, আটটির মধ্যে ছয়টি লক্ষ্যই প্রত্যক্ষভাবে শিশু সম্পর্কিত এবং শেষ দুটি লক্ষ্য পূরণও তাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি আনবে। এ বছরের বিশ্ব শিশু দিবস ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর গৃহীত শিশু অধিকার কনভেনশনের ২০তম বার্ষিকীও।

ফিলিস্তিনি জনগণের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস

ফিলিস্তিনি জনগণের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস ২৯ নভেম্বর। ১৯৭৭ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ প্রতি বছর ২৯ নভেম্বর ফিলিস্তিনি জনগণের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস হিসেবে পালনের আহ্বান জানায় (প্রস্তাব ৩২/৪০ বি)। ১৯৪৭ সালের এ দিনটিতে সাধারণ পরিষদ ফিলিস্তিন বিভক্তির ওপর প্রস্তাব গ্রহণ করে (প্রস্তাব ১৮১ (II)। ২০০৫ সালের ১ ডিসেম্বরের ৬০/৩৭ নং প্রস্তাবে পরিষদ ২৯ নভেম্বর ফিলিস্তিনি জনগণের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস পালনের অংশ হিসেবে জাতিসংঘে ফিলিস্তিনের স্থায়ী পর্যবেক্ষক মিশনের সহযোগিতায় ফিলিস্তিনিদের অধিকারের ওপর একটি বার্ষিক প্রদর্শনী বা একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অব্যাহতভাবে আয়োজন করে যাওয়ার জন্য ফিলিস্তিনি জনগণের অবিচ্ছেদ্য অধিকার প্রয়োগ সংক্রান্ত কমিটি এবং ফিলিস্তিনি অধিকার বিষয়ক বিভাগকে অনুরোধ করে। পরিষদ সদস্য দেশগুলোর প্রতি সংহতি দিবস পালনে ব্যাপক সমর্থনদান ও প্রচারণা চালানোর আহ্বানও জানিয়েছে।

ফিলিস্তিন প্রশ্ন

ইতিহাস ১৯১৭–১৯৪৭

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে তুরস্কের ওটোম্যান সাম্রাজ্য বিখন্ডায়নের মধ্য দিয়ে ফিলিস্তিন সমস্যা একটি আন্তর্জাতিক বিষয়ে পরিণত হয়। লীগ অব নেশনসের চুক্তিপত্র (ধারা ২২) অনুসারে লীগের গৃহীত ম্যান্ডেট ব্যবস্থার আওতায় যে কয়েকটি সাবেক অটোম্যান আরব ভূখন্ড গ্রেট ব্রিটেনের শাসনে ন্যস্ত করা হয় তার মধ্যে ছিল ফিলিস্তিন।

ম্যান্ডেটের মাধ্যমে প্রদত্ত ভূখন্ডগুলোর একটি ছাড়া বাকি সবগুলোই পূর্বধারণা অনুযায়ী পুরোপুরি স্বাধীন রাষ্ট্র হয়ে যায়। ব্যতিক্রম ছিল ফিলিস্তিন। ফিলিস্তিনে ইহুদি জনগণের একটি জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার প্রতি সমর্থন জানিয়ে ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ সরকারের জারিকৃত ‘বালফুর ঘোষণা’ বাস্তবায়নের প্রাথমিক উদ্দেশ্যে ম্যান্ডেট অনুযায়ী সেখানে ‘প্রশাসনিক সহায়তা ও পরামর্শদানে’ সীমিত থাকার ব্যত্যয় ঘটানো হয়।

১৯২২ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ফিলিস্তিন ম্যান্ডেটের বছরগুলোতে বিদেশ, বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপ থেকে ব্যাপকহারে ইহুদি অভিবাসন ঘটে। ১৯৩০–এর দশকে ইহুদি জনগণের ওপর কুখ্যাত নাৎসি নির্যাতনের ফলে অভিবাসীদের ঢল নামে। ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা দাবি এবং ইহুদি অভিবাসন প্রতিরোধ ১৯৩৭ সালে একটি বিদ্রোহের সূত্রপাত করে। এরপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালে ও তার অনতিপর লাগাতার চলতে থাকে উভয় পক্ষের সন্ত্রাস ও সহিংসতা। সহিংসতায় ক্ষতবিক্ষত একটি ভূখন্ডে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রেট ব্রিটেন বিভিন্ন ফর্মুলা বাস্তবায়নের চেষ্টা চালায়। ১৯৪৭ সালে গ্রেট ব্রিটেন সমস্যাটি জাতিসংঘের ওপর ছেড়ে দেয়।

১৯৪৭–১৯৭৭

বিভিন্ন বিকল্প খতিয়ে দেখার পর জাতিসংঘ জেরুজালেমকে আন্তর্জাতিক মর্যাদা দিয়ে ফিলিস্তিনকে ফিলিস্তিনি আরব ও ইহুদি অধ্যুষিত দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত করার প্রস্তাব দেয় (১৯৪৭ সালের ১৮১ (II) নং প্রস্তাব)। বিভক্তি পরিকল্পনার দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে একটি রাষ্ট্র ইসরাইল নামে তার স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং ১৯৪৮ সালের যুদ্ধে ফিলিস্তিন ভূখন্ডের শতকরা ৭৭ ভাগ দখল করে নেয়। ইসরাইল জেরুজালেমের বৃহত্তর অংশও দখল করে। মূল ফিলিস্তিনিদের অর্ধেকের বেশি পালিয়ে যায় কিংবা বহিষ্কৃত হয়। বিভক্তি প্রস্তাবে বর্ণিত ফিলিস্তিনি আরব রাষ্ট্রের ভূখন্ডের অবশিষ্ট অংশগুলো জর্ডান ও মিসর দখল করে। ফলে এ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় আর ঘটেনি।

১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইসরাইল ইতোপূর্বে জর্ডান ও মিসরের নিয়ন্ত্রণে থাকা ফিলিস্তিনের অবশিষ্ট ভূখন্ড (পশ্চিম তীর ও গাজা এলাকা) দখল করে নেয়। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল জেরুজালেমের অবশিষ্ট অংশ, যা পরবর্তীকালে গ্রাস করে ইসরাইল। এই যুদ্ধের ফলে দ্বিতীয়বারের মতো ফিলিস্তিনিরা ব্যাপকহারে দেশ ছেড়ে যায়, এদের সংখ্যা প্রায় ৫ লাখ। নিরাপত্তা পরিষদের ১৯৬৭ সালের ২২ নভেম্বরের ২৪২ (১৯৬৭) নং প্রস্তাবে ১৯৬৭ সালের সংঘাতে অধিকৃত ভূখন্ড থেকে প্রত্যাহারের জন্য

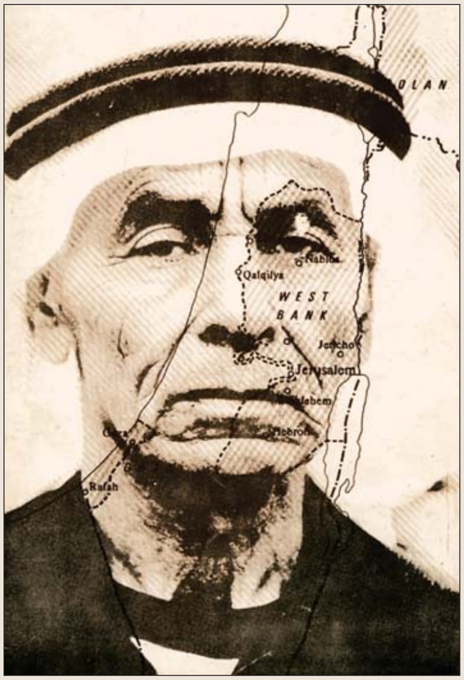

ইসরাইলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

১৯৭৪ সালে সাধারণ পরিষদ ফিলিস্তিনি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ, জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এবং প্রত্যাবর্তনের অবিচ্ছেদ্য অধিকার পুনর্ব্যক্ত করে। পরের বছর সাধারণ পরিষদ ফিলিস্তিনি জনগণের অবিচ্ছেদ্য অধিকার প্রয়োগ সংক্রান্ত কমিটি গঠন করে। সাধারণ পরিষদ পিএলওকে পরিষদ এবং জাতিসংঘের উদ্যোগে আয়োজিত অন্যান্য আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পর্যবেক্ষকের মর্যাদা দান করে।

১৯৭৭-১৯৯০

বাস্তবে অবশ্য ঘটনাপ্রবাহের ধারা নেতিবাচকই থেকে যায়। ১৯৮২ সালের জুনে পিএলওকে নির্মূলের ঘোষিত সঙ্কল্প নিয়ে লেবাননে হামলা চালায় ইসরাইল। একটি যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা করা হয়। পিএলও সৈনিকরা বৈরুত থেকে প্রত্যাহার করে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে এ শর্তে চলে যায় যে, ফেলে আসা হাজার হাজার ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুর নিরাপত্তা বিধান করা হবে। পরবর্তীকালে সাবরা ও শাতিলা শিবিরে উদ্বাস্তুদের ওপর এক ব্যাপক নিধনযজ্ঞ চালানো হয়।

১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বরে ব্যাপক অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ফিলিস্তিন প্রশ্নে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে জেনেভা ঘোষণা গ্রহণ করা হয়, যাতে যে নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত করা হয় তা ছিল : অধিকৃত ভুখণ্ডে বসতি স্থাপন ও জেরুজালেমের মর্যাদা পরিবর্তনের লক্ষ্যে ইসরাইলের গৃহীত ব্যবস্থার বিরোধিতা ও তা নাকচ করা, এ অঞ্চলের সব রাষ্ট্রের সব জনগণের ন্যায্যতা ও নিরাপত্তাসহ নিরাপদ এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সীমানার মধ্যে টিকে থাকার অধিকার থাকা এবং ফিলিস্তিনি জনগণের বৈধ ও অবিচ্ছেদ্য অধিকার অর্জন করা প্রয়োজন।

১৯৮৭ সালে ইসরাইলি দখলের বিরুদ্ধে অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভুখণ্ডে এক গণঅভ্যুত্থান হয় (ইনতিফাদা)। অভ্যুত্থান দমনে ইসরাইলি বাহিনীর গৃহীত ব্যবস্থায় বেসামরিক ফিলিস্তিনি জনগণের মধ্যে ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটে।

শান্তি প্রক্রিয়া

১৯৯১ সালের ৩০ অক্টোবর মাদ্রিদে মধ্যপ্রাচ্য সংক্রান্ত একটি শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবের ২৪২ (১৯৬৭) ও ৩৩৮ (১৯৭৩) ('শান্তির জন্য ভূমি' ফর্মুলা) ভিত্তিতে ইসরাইল ও আরব রাষ্ট্রগুলো এবং ইসরাইল ফিলিস্তিনিদের মধ্যে দুটি ধারায় সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে একটি ন্যায়ানুগ, স্থায়ী ও ব্যাপক শান্তি নিষ্পত্তি অর্জন করা। পরবর্তীকালে দফায় দফায় আলোচনার চূড়ান্ত পর্বে ১৯৯৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনে ইসরাইল রাষ্ট্রের সরকার ও ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতিনিধি ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থার (পিএলও) পারস্পরিক স্বীকৃতি এবং উভয় পক্ষের মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার নীতিমালা ঘোষণা ও পরবর্তী বাস্তবায়ন চুক্তিগুলো স্বাক্ষরিত হয়। যার ফলশ্রুতিতে ইসরাইলি বাহিনীর আংশিক প্রত্যাহার, ফিলিস্তিনি পরিষদ ও ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, আংশিক বন্দিমুক্তি ও ফিলিস্তিনি স্বায়ত্তশাসনাধীন এলাকায় কার্যপরিচালন প্রশাসন প্রতিষ্ঠার মতো বেশ কয়েকটি অনুকূল অগ্রগতি ঘটে। আন্তর্জাতিক বৈতার অভিভাবক এবং আন্তর্জাতিক সহায়তার ব্যবস্থা ও সংস্থানের জন্য শান্তি প্রক্রিয়ায় জাতিসংঘের সংশিস্নষ্টতা অপরিহার্য ছিল। ২০০০ ও ২০০১ সালে ইসরাইলি ও ফিলিস্তিনিরা একটি চূড়ান্ত অবস্থার চুক্তি নিয়ে আলোচনা করে, যা সামুদয়িক প্রমাণিত হয়।

২০০০ সালে আল-হারাম আল-শরীফে লিকুদের এরিয়েল শ্যারনের বিতর্কিত সফরের পর দ্বিতীয় ইনতিফাদা ছড়িয়ে পড়ে। ফলে, ব্যাপক প্রাণহানি, ফিলিস্তিনি স্বায়ত্তশাসনাধীন ভূখণ্ড পুনর্দখল, সামরিক হামলা, সন্দেহভাজন ফিলিস্তিনি জঙ্গিদের বিচার-বহির্ভূত হত্যা, আত্মঘাতী হামলা, মর্টার ও রকেট হামলা এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি ঘটে। ইসরাইল অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে অবস্থিত পশ্চিম তীরে একটি পৃথকীকরণ দেয়াল নির্মাণ শুরু করে যা আন্তর্জাতিক আদালত ২০০৪ সালে অবৈধ ঘোষণা করে। ২০০২ সালে নিরাপত্তা পরিষদ নিরাপদ ও স্বীকৃত সীমান্তের মধ্যে পাশাপাশি অবস্থানরত দুটি রাষ্ট্র, ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের স্বপ্নরূপ ব্যক্ত করে প্রস্তাব ১৩৯৭ গ্রহণ করে। ২০০৩ সালে মধ্যপ্রাচ্য চতুর্পক্ষ (যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, রাশিয়া ও জাতিসংঘ) নিরাপত্তা পরিষদের ১৫১৫ সংখ্যক প্রস্তাবের মাধ্যমে অনুমোদিত দুই রাষ্ট্র সমাধানের একটি বিশদ রোডম্যাপ প্রকাশ করে। ২০০৫ সালে ইসরাইল তার 'সংঘাত নিবৃত্তি পরিকল্পনার' অংশ হিসেবে গাজা এলাকা থেকে বসতি স্থাপনাকারী ও সৈন্য সরিয়ে নেয়। তবে সীমান্ত, সমুদ্রোপকূল ও আকাশসীমায় কার্যকর নিয়ন্ত্রণ বহাল রাখে। ২০০৬ সালে ফিলিস্তিনি আইন পরিষদ নির্বাচনের পর মধ্যপ্রাচ্য চতুর্পক্ষ জানায় যে, অহিংসতার প্রতি নতুন সরকারের অঙ্গীকার, ইসরাইলকে স্বীকৃতিদান এবং পূর্ববর্তী চুক্তিগুলো গ্রহণ করে নেয়ার ওপর ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে ভবিষ্যতে সাহায্য দেয়ার বিষয়টি দাতারা পর্যালোচনা করে দেখবে।

নারীর প্রতি সহিংসতা অবসানে আন্তর্জাতিক দিবস

'আমাদের লক্ষ্য সুস্পষ্ট : যুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে ধর্ষণের ব্যবহার, পারিবারিক সহিংসতা, যৌন পাচার, তথাকথিত 'ইজ্জতমুলক' অপরাধ কিংবা নারীর যৌনাঙ্গাছেদ/কর্তন যাই হোক না কেন–এসব অপরাধের অবসান ঘটানো। বৈষম্য দুরীকরণ এবং যে মানসিকতা এটাকে স্থায়ী রুপ দিয়েছে তা পরিবর্তনের মাধ্যমে এই সহিংসতার মুল আমাদের উৎপাটন করতে হবে।'

মহাসচিব বান কি-মুন
নারীর প্রতি সহিংসতা অবসানে আন্তর্জাতিক দিবসে বাণী
২৫ নভেম্বর ২০০৯

১৯৯৯ সালের ১৭ ডিসেম্বরের ৫৪/১৩৪ নং প্রস্তাবের মাধ্যমে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ২৫ নভেম্বরকে নারীর প্রতি সহিংসতা অবসানে আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে ঘোষণা করে এবং এ সমস্যা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর প্রতি এদিন বিভিন্ন কার্যক্রম আয়োজনের আহ্বান জানায়। নারী কর্মকুশীলবরা ১৯৮১ সাল থেকে ২৫ নভেম্বরকে নারীর প্রতি সহিংসতা অবসান দিবস হিসেবে চিহ্নিত করে। ১৯৬০ সালে ডোমিনিকান শাসক রাফায়েল ট্রুজিলোর (১৯৩০-১৯৬১) নির্দেশে ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রে রাজনৈতিক কর্মকুশীলব তিন মিরাবল ভগ্নিকে নৃশংসভাবে হত্যার স্মৃতি ধরে এ দিনটি এসেছে। ১৯৯৩ সালের ২০ ডিসেম্বর সাধারণ পরিষদ ৪৮/১০৪ নং প্রস্তাবের মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতা অবসান ঘোষণা গ্রহণ করে।

৩০ বছর

নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্যের অবসান সংক্রান্ত জাতিসংঘ কনভেনশন

কনভেনশনের কথা

নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্যের অবসান সংক্রান্ত কনভেনশন (সিডো) আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তি যা পুরোপুরি লিঙ্গাভিত্তিক সমতার প্রতি নিবেদিত। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর এ কনভেনশন গ্রহণ করে এবং এটাকে প্রায়ই নারীর আন্তর্জাতিক বিল অব রাইটস হিসেবে অভিহিত করা হয়। একটি প্রস্তাবনা ও ৩০টি ধারার সমন্বয়ে এই কনভেনশনে নারীর প্রতি বৈষম্যের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এবং এ ধরনের বৈষম্যের অবসানে জাতীয় কার্যক্রমের একটি এজেন্ডা উপস্থাপন করা হয়েছে।

কনভেনশনে নারীর প্রতি বৈষম্যের সংজ্ঞা দিয়ে বলা হয়েছে, এটা হলো 'রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক বা অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতার ভিত্তিতে বৈবাহিক মর্যাদা নির্বিশেষে নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার স্বীকৃতি, ভোগ বা প্রয়োগকে ব্যাহত বা বাতিল করার মতো না করার উদ্দেশ্যে লিঙ্গাভিত্তিক যে কোনো পার্থক্য, বর্জন বা বিধিনিষেধ আরোপ করা।' কনভেনশন অনুযায়ী সব 'রাষ্ট্রপক্ষকে পুরুষের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাগুলো প্রয়োগ ও ভোগ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে তাদের পুর্ণ বিকাশ ও অগ্রগতির নিশ্চয়তা বিধানে আইন প্রণয়নসহ সব উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে' (ধারা ৩)। এর মধ্যে রয়েছে কেবল বৈষম্যমুলক আইন বাতিল নয় বরং লিঙ্গা-সংবেদনশীল নতুন নতুন আইন ও নীতি প্রবর্তন, সরকারের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি, চর্চা ও পদ্ধতির পরিবর্তন, নারীর প্রতি বেসরকারি সংস্থা ও

ব্যক্তি নাগরিকের বৈষম্য না করা নিশ্চিত করা এবং ক্ষতিকর সাংস্কৃতিক গতানুগতিকতার পরিবর্তন ঘটানো। কনভেনশন তাই সমতা অর্জিত হয়েছে কিনা তা সত্যিকারভাবে পরিমাপের জন্য আইনের শব্দনিচয়ের পরিবর্তে নারীর প্রকৃত জীবনের অবস্থাকে গ্রহণ করেছে।

কনভেনশনের পক্ষভুক্ত হয়ে রাষ্ট্রগুলো নারীর প্রতি বৈষম্য অবসানে যেসব ধারাবাহিক ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকার করে, তার মধ্যে রয়েছে :

- তাদের আইনি ব্যবস্থায় নারী-পুরুষের সমতার নীতি অন্তর্ভুক্ত করবে, সব বৈষম্যমূলক আইন বিলোপ করবে এবং নারীর প্রতি বৈষম্য নিষিদ্ধ করে উপযুক্ত আইন গ্রহণ করবে;
- বৈষম্যের বিরূদ্ধে নারীর কার্যকর সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ট্রাইব্যুনাল ও অন্যান্য জনপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করবে; এবং
- ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক সব কাজের অবসান নিশ্চিত করবে।কখনো কখনো, যেসব ক্ষেত্রে বৈষম্যের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবে নারীর গুরুতর অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে আইনে এমন বিধান দরকার যা নারীর প্রতি কেবল পুরুষের সমান আচরণ নয় বরং অগ্রাধিকারভিত্তিক আচরণের ব্যবস্থা করবে। কনভেনশনের ধারা ৪-এ সমতা অর্জন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে একটা সময়ের জন্য (রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে কোটা আইনের মতো) 'সাময়িক বিশেষ ব্যবস্থা'র বিধান প্রয়োজন হতে পারে।

কনভেনশন প্রায় সর্বজনীন অনুমোদন লাভ করেছে, এ পর্যন্ত ১৮৬টি দেশ এর পক্ষ হয়েছে। রাষ্ট্রপক্ষগুলোর নারীর মানবাধিকারকে শ্রদ্ধা করা, রক্ষা করা ও পূরণ করার মতো তিনটি বাধ্যবাধকতা রয়েছে। 'শ্রদ্ধা' করতে হলে রাষ্ট্রের নিজেকে নারীর মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় এমন যে কোনো আচরণ বা কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। 'রক্ষা করা'র জন্য রাষ্ট্রকে ব্যক্তি, গ্রুপ, প্রতিষ্ঠান ও করপোরেশনের মতো রাষ্ট্র নয় এমন সবার লঙ্ঘন রোধ করতে হবে। আর 'পূরণের' জন্য রাষ্ট্রকে নারীর মানবাধিকার পুরোপুরি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নিতে হবে।

কনভেনশন সুস্পষ্টভাবে বলেছে যে, এসব দায়িত্ব ব্যক্তিগত জীবন থেকে জনজীবন পর্যন্ত বিস্তৃত। ঐতিহাসিকভাবে, অনেক দেশে নারীর অধিকার বাস্তবায়নে সবচেয়ে বড় বাধাগুলোর একটি হলো এই ধারণা যে, রাষ্ট্রকে পারিবারিক সম্পর্কের 'ব্যক্তিগত' অঙ্গনে হস্তক্ষেপ করা ঠিক নয়। কনভেনশন স্বীকার করে যে, ব্যক্তিগত অঙ্গনে অসম ক্ষমতার সম্পর্ক নারীর জীবনের সব ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক অসমতায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে এবং তাই ক্ষমতার এই অসমতা সংশোধনে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কনভেনশন রাষ্ট্রগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে।

৩০ বছর

নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্যের অবসান সংক্রান্ত জাতিসংঘ কনভেনশন

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ৩০ বছর আগে ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর নারীর জন্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তি নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্যের অবসান সংক্রান্ত কনভেনশন (সিডো) গ্রহণ করে। ২০০৯ সালে আমরাও কনভেনশনের ঐচ্ছিক প্রটোকলের দশম বার্ষিকী উদযাপন করছি। এই প্রটোকল সিডো কমিটিকে ব্যক্তির উত্থাপিত অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ শোনার ক্ষমতা দিয়েছে। এখন পর্যন্ত ১৮৬টি দেশ এই কনভেনশন এবং এগুলোর মধ্যে ৯৮টি দেশ ঐচ্ছিক প্রটোকল অনুমোদন করেছে।
কনভেনশনের ৩০তম বার্ষিকী এর প্রায় সর্বজনীন অনুমোদন এবং সিডো বাস্তবায়ন ও দৈনন্দিন বাস্তব পর্যায়ে নারী ও মেয়েদের প্রকৃত প্রাপ্তির জন্য জাতীয় পর্যায়ে অর্জিত সাম্প্রতিক অগ্রগতি উদযাপনের একটা সুযোগ এনে দিয়েছে। লিঙ্গভিত্তিক সমতার নীতি অন্তর্ভুক্ত করে নতুন নতুন সংবিধান এবং জাতীয় আইন ও নীতি গ্রহণের মধ্য দিয়ে নারীর মানবাধিকার এখন জাতীয় মানে পরিণত হচ্ছে। যে নেতৃত্ব ইতোমধ্যেই দেখানো হয়েছে তা কনভেনশন বাস্তবায়নে যেসব দেশের জ্ঞান, অঙ্গীকার বা আইনি কাঠামোর অভাব রয়েছে সেসব দেশকে সহায়তাদানের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে।

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৮১১ ৮৬ ০০, ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor : Kazi Ali Reza, Phone : 811 86 00 e-mail : info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org